সাতদিন

৬ ফেব্রুয়ারি : লং মার্চ শেষে কারাগার থেকে ধীরে ধীরে মুক্তি পাচ্ছে গণগ্রেপ্তারের শিকার মানুষেরা।
৭ তারিখের মধ্যে নতুন গ্রাহক ফরম চালুর নির্দেশ দিয়ে মোবাইল সংস্থাগুলোকে বিটিআরসির চিঠি।
৭ ফেব্রুয়ারি : রাবির শিক্ষক হত্যার অভিযোগে আরেক শিক্ষক গ্রেপ্তার।
টাটার সঙ্গে গ্যাসের দাম নিয়ে সারা দিন দরকষাকষি করেছে বাংলাদেশ সরকার।
৮ ফেব্রুয়ারি : আদালতে সানি ও আউয়ালের স্বীকৃতি, 'বিদেশী জঙ্গিরা জেএমবিকে সাহায্য করে।'
সাংবাদিকদের উদ্দেশ করে আইনমন্ত্রী, 'বিচার বিভাগ ২০১২ সালের মধ্যে পৃথক হবে।'
৯ ফেব্রুয়ারি : ঝালকাঠিতে বিচারক হত্যার রায়ে সানি, আউয়াল ও মামুনের যাবজ্জীবন।
রাবি ক্যাম্পাসে জঙ্গি মিছিল, শিবির নেতাকে গ্রেপ্তার না করতে চাপ প্রয়োগ।
১০ ফেব্রুয়ারি : ১ বছর পর সংসদে আওয়ামী লীগ।
১১ ফেব্রুয়ারি : সংসদে গিয়েই সংস্কার প্রস্তাব তুললেন শেখ হাসিনা।
দেড় লাখ আটকে পড়া পাকিস্তানি বাংলাদেশের ভোটার হচ্ছেন।

১৪ দলের বুদ্ধিতে সংসদে আওয়ামী লীগ

অনিরুদ্ধ ইসলাম

বিরোধীদলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা লংমার্চ সমাপ্তি জমায়েতে চৌদ্দ দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কারের প্রস্তাব জাতীয় সংসদে উত্থাপন করার কথা বলেছেন। পল্টনের ৫ ফেব্রুয়ারির ওই জমায়েতে তিনি বলেন, সংস্কার প্রস্তাব অস্বীকার করার কোনো অজুহাত তিনি জোট সরকারকে দিতে রাজি নন। আর সে কারণে তিনি ও তার দল সংসদে গিয়ে ওই প্রস্তাব উত্থাপন করবেন এবং জোট সরকার যদি প্রস্তাবে রাজি না হয়, তবে সংসদ থেকে পদত্যাগ করে রাজপথের আন্দোলনে সরকারকে ওই দাবি মানতে বাধ্য করবেন।

লংমার্চ শেষে শেখ হাসিনার এই ঘোষণা রাজনৈতিক মহলসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে। রাজনৈতিক অভিজ্ঞ বিশ্লেষকদের মতে, এটা তার ও আন্দোলনরত বিরোধী দলের একটি বিচণ পদপে। এর মধ্য দিয়ে বিরোধী দল সংসদকে, বিশেষ করে সংসদ অধিবেশনে বিরোধী দলের অংশগ্রহণের বিষয়কে রাজপথের আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত করল। সরকারি দল এতদিন বলে এসেছিল, নির্বাচনী সংস্কারের বিষয়টি সংসদে প্রথমে পেশ করতে হবে। তারপর এ নিয়ে সংসদের ভেতরে ও বাইরে উভয় ত্রে আলোচনা হতে পারে। এখন বিরোধী দল এই পদপে নেয়ায় বল তাদের কোর্টেই ঠেলে দেয়া হলো। তাদেরই এখন ঠিক করতে হবে, তারা এ ব্যাপারে কী করবেন। অন্যদিকে বিরোধী দলও সংসদ থেকে পদত্যাগ করার অথবা নব্বই দিন কার্যদিবসে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাদের সদস্যপদ খারিজ হয়ে যাওয়ার অবস্থা থেকে আপাতত মুক্ত হলেন। এর ফলে জোট সরকার সংবিধান অনুসারে ওই সব শূন্যপদে উপনির্বাচন করার যে হুমকি দিয়ে এসেছিল, সেটা তাদের মোকাবেলা করতে হবে না। বরং সংসদ অধিবেশনে যোগদানের সুযোগ নিয়ে তারা তাদের আন্দোলনের সপে যুক্তিগুলো দেশবাসীর কাছে আরো জোরেসোরে হাজির করতে পারবে। সংসদে বিরোধী দলের এই যোগদান বিদেশী রাষ্ট্রদূত বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নকে সন্তুষ্ট করবে এবং করেছেও। তাদের মুখপাত্র বিরোধী দলের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন ইতিমধ্যে। এর ফলে বিরোধী দল, বিশেষ করে আওয়ামী লীগের ওপর থেকে আন্তর্জাতিক চাপও সরে গেল। অন্যদিকে জোট সরকার এখন চাপে পড়বে এ কারণে যে, এসব দেশ বিশেষ করে ইইউ বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রকাশ্যেই সন্দেহ ব্যক্ত করেছে। ইইউর যে ট্রয়কা সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করে গেছে, তারা ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে যে, বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন সচিবালয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরাধীন থাকাকে তারা অনুমোদন করে না। নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা নিয়েও তারা প্রশ্ন তুলেছে।

বিরোধী চৌদ্দ দল ও বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সংসদে যোগদানের এই সিদ্ধান্ত কিছুদিনের জন্য হলেও আন্দোলনকে সংসদ অভিমুখী করবে। আওয়ামী লীগ গত ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে ৩১ দফা সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। তবে প্রস্তাব উত্থাপনের পর এর পরিণতি দেখার জন্য তারা কতো দিন অপো করবে এবং ইতিমধ্যে জনজীবনের সংকটগুলো, বিশেষ করে জঙ্গি সমস্যা, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সমস্যা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, প্রশাসনে দলীয়করণ, গ্রেনেড হামলা ও

রাজনীতিক হত্যাকান্ডের তদন্ত ও বিচার ইত্যাদি ইস্যু নিয়ে সংসদে আলোচনা করবে কি না সে ব্যাপারে জানা যায়নি। আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী কমিটি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব সভানেত্রী শেখ হাসিনার ওপর ছেড়ে দিয়েছে। চৌদ্দ দলের নেতারাও এ নিয়ে শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করবেন। তবে এটা মোটামুটি নিশ্চিত যে, বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা পদত্যাগ করলে সরকার যাতে উপ-নির্বাচনের সুযোগ না পায়, তত দিন পর্যন্ত আন্দোলনের কৌশল হিসেবে সংসদকে ব্যবহার করা হবে।

আন্দোলনের পদপে হিসেবে সংসদ অধিবেশনে যোগদানের বিষয়টি আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে এবং রাজনৈতিক মহলে আলোচিত হলেও সভানেত্রী এ বিষয়ে একেবারেই রাজি ছিলেন না। এ বিষয়ে তার অনড় অবস্থান দলের সিনিয়র নেতারা অনুমোদন না করলেও তারা শেখ হাসিনার সঙ্গে কোনো প্রকার বিরোধে যেতে চাননি। বিশেষ করে সংসদ পরিচালনায় স্পিকার ও জোট সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে তারা নিশ্চিত ছিলেন না। বরং অবস্থাদৃষ্টে এটাই মনে হয়েছে, জোট সরকারই চায় না আওয়ামী লীগ বা শেখ হাসিনা সংসদে আসুক। এ অবস্থায় শেখ হাসিনাকে রাজি করিয়ে সংসদে নিয়ে গিয়ে একটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে তারা সাহস করেননি। আওয়ামী লীগের মিত্র চৌদ্দ দলের অন্যান্য দল অবশ্য সব সময়ই মনে করেছে যে, আওয়ামী লীগ সংসদে গিয়ে জাতীয় ইস্যুগুলো নিয়ে কথা বলুক। তাতে রাজপথের আন্দোলন আরো বেগবান হবে। আর তা ছাড়া তাদের যুক্তি ছিল যে জাতীয় সংসদ জনগণের সংগ্রামের ফসল। তাকে অকার্যকর করে দিয়ে জনগণের সেই অর্জনকেই জোট সরকার কৌশলে নাকচ করে দিচ্ছে। বস্তুত, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া অথবা বিএনপি কেউই সংসদে স্বস্তিবোধ করেন না। আর সে কারণে বেগম খালেদা জিয়া তো বটেই, তার দলীয় সংসদ সদস্যরাও সংসদ অধিবেশনে যোগ দিতে বিশেষ আগ্রহ বোধ করেন না। এর ফলে সংসদে জোটের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার পরও সংসদ অধিবেশনকে প্রায়ই কোরাম সংকটে পড়তে হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে সংসদ কার্যকর করতে বিরোধী দলের অধিবেশনে যোগদান তারা জরুরি মনে করেছে। কিন্তু চৌদ্দ দলের শরিকরাও শেষদিকে এসে সংসদ অধিবেশন সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তাদের বক্তব্য, সংসদ ১৭ আগস্টের বোমা বিস্ফোরণের মতো জাতীয় নিরাপত্তা অথবা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিসহ জনজীবনের সংকট নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করে না। যে সংসদ সদস্যরা কেবল নিজেদের বেতন-ভাতা, বিদেশ ভ্রমণ এবং সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য দেয়া অর্থের পার্সেন্টেজের বিষয়েই আগ্রহী, সেই সংসদের কোনো প্রাসঙ্গিকতা জনগণের কাছে নেই। আর স্বাভাবিকভাবে ওই সংসদ অধিবেশনে যোগ দেয়া হলো কি না হলো, তাতে কারও আগ্রহ থাকার কথা নয়।

কিন্তু বিরোধী দলের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সেই সংসদ অধিবেশনই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় চৌদ্দ দলের কাছে। চৌদ্দ দল এই অভিমতে পৌঁছায় যে, আন্দোলনকে গতি দিতে হলে সংসদের ইস্যুকেও এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। সংবিধানের বিধান অনুসারে নব্বই দিনের কার্যদিবস অনুপস্থিত থাকার কারণে সংসদ সদস্য পদ শূন্য হওয়া কোনো কাজের কথা নয়। আবার পদত্যাগ করার মতো পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয়নি। পদত্যাগ করতে হলে

কেউ ভাবে না কৃষকের কথা

'কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে' এই কথাটি প্রবাদে পরিণত হলেও নানান সংকটে ফেলে কৃষককে এখন পর্যুদস্ত করে ফেলা হয়েছে। নীতি নির্ধারণের কোনো ক্ষেত্রেই কৃষককে অগ্রাধিকার দেয়া হয়নি। ফলে বরাবরই ফসলের উৎপাদন অথবা উৎপাদিত ফসলের বিক্রয় দর প্রাপ্তির অনিশ্চয়তার মধ্যেই থাকতে হয় কৃষককে। কোটি মানুষের অন্ন যোগালেও তার নিজের ঘরে বিরাজ করে ক্ষুধা আর হাহাকারের কষ্ট। যেসব ভ্রান্ত নীতিতে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের একটি হলো, ন্যায্যমূল্যে কৃষককে সার দিতে অস্বীকার করা। এই কাণ্ড এবারও ঘটেছে। কৃষকরা তাদের প্রয়োজন মতো সার পাচ্ছে না। আর পেলেও কিনতে হচ্ছে চড়া দামে। উত্তরাঞ্চলে এ সমস্যা বেশি প্রকট। শস্যভাণ্ডার খ্যাত উত্তরাঞ্চলে এবারে ১৭ লাখ ৭০ হাজার হেক্টর জমি বোরো আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সার ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬ লাখ ৮০ হাজার টন। সার সংকট মোচনের জন্য বিসিআইসি উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলায় ১৪টি বাফার গুদামে ১৬ হাজার টন সার মজুদ করেছে। এই মজুদ পর্যাপ্ত বলে সরকারের তরফ থেকে দাবি করা হলেও চাষীরা ভর্তুকি দামে সার পাচ্ছে না। আমদানিকারক ও সার ডিলারদের অধিকাংশই ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে জড়িত। ভর্তুকির দামে সার বাজারে ছাড়তে তারাই বাধা দিচ্ছে। কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে মুনাফা লোটার অপেক্ষায় আছে। অথচ সংকট নিরসনে সরকারের তরফ থেকে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

উত্তরাঞ্চলে আবার দেখা দিয়েছে ডিজেলের সংকট। যমুনা নদীর নাব্যতা না থাকায় দেড় মাস ধরে জ্বালানিবাহী জাহাজ বগুড়ার বাঘাবাড়ী ঘাটে ভিড়তে পারেনি। ফলে বিপিসির জ্বালানি বিপণন সংস্থা পদ্মা, যমুনা, মেঘনার ডিপো থেকে এ অঞ্চলে জ্বালানি সরবরাহ করা যাচ্ছে না। জ্বালানি সংকটের এই সুযোগে ডিজেলের দাম বেড়েই চলেছে। ৩৩ টাকা লিটারের ডিজেল ৪৫ টাকাতেও পাওয়া যাচ্ছে না। এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে বোরো আবাদের উপর। বগুড়া, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, জয়পুরহাট জেলায় হাজার হাজার একর জমি শুকিয়ে গেছে। ধানের চারা মারা পড়তে চলেছে। সংকট নিরসনে বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতুপথে রেলযোগে জ্বালানি সরবরাহের কথা থাকলেও রেলওয়ের ওয়াগন সংকটে এ পথেও জ্বালানি সরবরাহ করতে পারছে না বিপিসি। একই সংকটে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার ৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কেন্দ্রটি বন্ধ হলে জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিডে আরো প্রায় ৩৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ঘাটতি দেখা দেবে। নগরীর মানুষকে সইতে হবে আরো বেশি লোডশেডিংয়ের বিড়ম্বনা।

সংকট সৃষ্টি হয়েছে মানুষের জীবনযাত্রার মৃসণ প্রবাহেও। ক্রমশ কমছে টাকার মান, বাড়ছে দ্রব্যমূল্য ও জীবনযাত্রার ব্যয়। ডলারের বিপরীতে টাকার ক্রমশ অবমূল্যায়ন হওয়ায় আমদানিকৃত পণ্য এবং কাঁচামালের দাম বেড়ে গেছে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে স্থানীয় বাজারে। আবার চাহিদা অনুযায়ী ডলারের সরবরাহ যথেষ্ট না হওয়ায় ডলার সংকটও তীব্র হচ্ছে। ডলারের এই সংকটে আমদানির ওপর চাপ পড়ায় ভোগ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। যার সরাসরি প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ক্রেতাসাধারণ।

এসব সংকটের সবগুলোই কৃত্রিম। ইচ্ছা আর আন্তরিকতা থাকলে সবগুলোরই সমাধান করা যেত অনেক আগে। উপকার হতো মানুষের। কিন্তু মানুষের উপকারের কথা ভাববে এমন সুহৃদ কে আছে?

শামীম সুফী

আওয়ামী লীগের সদস্যদের সঙ্গে অন্ততপে বিরোধী অন্য সদস্যরা তো বটেই, এমনকি বিএনপির কিছু সদস্যকে দিয়ে বিদ্রোহ ঘটিয়ে তাদের বের করে আনতে হবে। কিন্তু জাতীয় পার্টি (এরশাদ), জাতীয় পার্টি (মঞ্জু), কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের কাদের সিদ্দিকীর সদস্যদের কারও পদত্যাগের সে ধরনের কোনো সম্ভাবনা না থাকায় সেটা কোনো কার্যকর কৌশল হবে না বলে চৌদ্দ দল নেতারা মনে করেন। বরং সংসদে সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করে জোট কর্তৃক সেটা প্রত্যাখ্যাত হলে এ বিষয়ে জোটের মুখোশ উন্মোচন করা যাবে। এই যুক্তির ভিত্তিতেই চৌদ্দ দলের লিয়াঁজো কমিটিতে সংসদ অধিবেশনে যোগদানের প্রশ্নটি আন্দোলনের কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা রাশেদ খান মেনন। তাকে সমর্থন করেন জাসদের হাসানুল হক ইনু এবং এগার দল ও ন্যাপের নেতৃবৃন্দ। লিয়াঁজো কমিটিতে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্যরা একমত পোষণ করলেও তারা সভানেত্রী শেখ হাসিনার মনোভাব না জেনে কিছু বলতে রাজি হননি। ফলে শেখ হাসিনাসহ চৌদ্দ দলের নেতাদের বৈঠকে এই প্রস্তাব উত্থাপন করার দায়িত্ব পড়ে এগার দলের ওপর। শেখ হাসিনার হজযাত্রা-পূর্ব বৈঠকে এ ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত না হলেও তিনি হজ থেকে ফিরে আসার পর দু'দফা বৈঠকে বিষয়টি চূড়ান্ত হয়। এবং ৫ ফেব্রুয়ারির সমাবেশে শেখ হাসিনা ওই ঘোষণা দেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সংসদ অধিবেশনে আওয়ামী লীগের এই যোগদান রাজনৈতিক অঙ্গনে স্বস্তি ফিরিয়ে এনেছে। কিন্তু তার পরও চায়ের কাপ ও ঠোঁটের মধ্যে অনেক ফাঁক রয়ে গেছে। আইনমন্ত্রী এবং বিএনপি মহাসচিব প্রকাশ্যে সংসদে যোগদানের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কণ্ঠে ভিন্ন সুর শোনা গেছে। তিনি পিরোজপুরের জনসভায় বলেছেন, পদে পদে ব্যর্থ হয়ে এখন তারা সংসদ অধিবেশনে যোগ দিচ্ছে। জানা গেছে, অধিবেশনে আওয়ামী লীগকে উত্ত্যক্ত করার জন্য বিএনিপর বেশ ক'জন সংসদ সদস্যকে ঠিক করা হয়েছে, যাতে তারা অধিবেশন ছেড়ে বেরিয়ে যায়। অপরদিকে আওয়ামী লীগের প থেকেও প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। রাজপথের সংঘর্ষ এখন সংসদে বিস্তৃত হলেও আশ্চর্যের কিছু হবে না। তবে সেটা বাকযুদ্ধে সীমিত থাকবে বলেই সবার আশা। চৌদ্দ দল আন্দোলনের সঙ্গে সংসদের প্রশ্নকে যুক্ত করে জোটের সামনে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হাজির করেছে। জোট তা কীভাবে মোকাবেলা করবে, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

বোমার শব্দ শুনতে পায় না আড়ি পেতে কি শুনতে চায়...

গত ১২ ফেব্রুয়ারি সংসদ অধিবেশনে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ সংশোধন বিল ২০০৬ অর্থাৎ আড়িপাতা বিল পাস হয়েছে। বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের প্রবল বিরোধিতা, সমালোচনা আর ওয়াকআউটের মুখেও বিলটি পাস হয়েছে।

এই বিল পাস হওয়ায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত যেকোনো কর্মকর্তা সরকারি-বেসরকারি সব ধরনের টেলিফোন আলাপ রেকর্ড করতে পারবেন, কথোপকথন বন্ধ করে দিতে পারেন, আলাপকারীদের যেকোনো সময় জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন, এমনকি যেকোনো টেলিফোন কোম্পানির লাইসেন্স স্থগিত করতে পারবে সরকার। সরকারের এ কাজে বিরোধী দলসহ বিভিন্ন মহল আশঙ্কা প্রকাশ করছে। তারা বলছেন, আড়িপাতা ব্যক্তিস্বাধীনতা, নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও সাংবিধানিক অধিকার পরিপন্থী।

সরকার যুক্তি হিসেবে দেখাচ্ছে, জঙ্গিদের চিহ্নিত করার জন্য এ আইন করা। অথচ কী বিস্ময়! এই চারদলীয় জোট সরকার জঙ্গিদের বছরের পর বছর আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে।

জঙ্গি দমনে প্রকৃত সদিচ্ছা সরকার এখন পর্যন্ত দেখাতে পারেনি। বড় নেতাদের ধরতে পারেনি। জঙ্গিদের অর্থের উৎসের সন্ধানও করেনি। রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে টেলিফোনে আড়িপাতার আইন বলবৎ করার প্রয়োজন হতো না। বরং আগামী নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের হয়রানি করার হাতিয়ার হিসেবে এ আইনটি ব্যবহার করবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই আইনের আওতায় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়বে, দুর্বৃত্তরা দুর্নীতিবাজ প্রশাসনের সহায়তায় আরো বেপরোয়া হয়ে উঠবে। সংবাদ মাধ্যমের ওপর নির্যাতন বাড়বে। সব মিলিয়ে একটি সামরিক স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে দেশকে। এমতাবস্থায় সুশীল সমাজের প্রশ্ন, জঙ্গিদের বোমার শব্দ যে সরকার শুনতে পায় না, আড়ি পেতে কী শুনতে চায়?

এসআর খান

দরিদ্র দেশ ও জনগণের অবস্থান হোক কর্পোরেট স্বার্থের ঊর্ধ্বে

গত ৩১ জানুয়ারি ২০০৬ জাতীয় প্রেসক্লাবে এ্যাকশন এইডের উদ্যোগে 'দরিদ্র দেশ ও জনগণের অবস্থান হোক কর্পোরেট স্বার্থের ঊর্ধ্বে' শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় কর্পোরেশনসমূহের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব উন্মোচন করা হয়।

গত দু'দশক ধরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের পরিবেশের ক্ষেত্রে একটি নাটকীয় পরিবর্তন এসেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, বিশ্বব্যাংক ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কর্তৃক উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ ও বিনিয়ন্ত্রণের ঢেউ বিশ্ব অর্থনীতিতে অবয়ব, ক্ষমতা ও প্রভাবের ক্ষেত্রে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর বিকাশে সহায়তা করেছে। যদিও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা জনস্বার্থে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে কর্তৃত্ব রাখে, তথাপি এর নীতিমালাসমূহ উন্নয়নশীল দেশ এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিপরীতে ধনী দেশগুলোর প্রতি পক্ষপাতমূলক বলে প্রতীয়মান। এসব নীতিমালা বহুজাতিক সংস্থাগুলোর জন্য বিপুল সম্পদ সৃষ্টির পথ তৈরি করে দিয়েছে, যা এ সংস্থাগুলোকে বিশ্ব বাণিজ্যসংস্থার নীতিমালা প্রভাবিত করার জন্য শক্তি যুগিয়েছে। এ শক্তির বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় সাম্প্রতিককালে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাজধানী শহরগুলোতে গড়ে ওঠা ব্যাপকসংখ্যক তদবিরকারী প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি থেকে। এদের রাজধানী শহরগুলো বাণিজ্য পরাশক্তি হিসেবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধান তৈরিতে তাদের নিজস্ব নীতিমালা বানায়। এই দুই পরাশক্তির অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষমতার ব্যাপ্তি বোঝা যায় তাদের তদবিরকর্মী নিয়োগের মাত্রা এবং এ কর্মীদের পেছনে ব্যয়ের পরিধি থেকে। একটি হিসাব অনুযায়ী, ব্রাসেলসে ৭০ শতাংশের অধিক তদবিরকর্মী ব্যবসায়িক স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ব করে, যেখানে পরিবেশ, মানবাধিকার, জনস্বাস্থ্য এবং উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করছে এমন কর্মীর সংখ্যা মাত্র ১০ ভাগ। এ উদ্দেশ্যে শুধু ব্রাসেলসে ৭৫০ থেকে ১ বিলিয়ন ইউরো পর্যন্ত খরচের একটি হিসাব পাওয়া যায়। খরচের এই ব্যাপ্তি এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে, যা একাধিক উন্নয়নশীল দেশের সমন্বিত মোট অর্থনৈতিক উৎপাদনের সমান বলে জানা যায়।

ছাত্রদলের কর্মকান্ডে বিব্রত বিএনপি

মামুন রহমান, *যশোর থেকে*

গত বছর ৮ অক্টোবর সন্ধ্যারাতে হঠাৎ করেই বিকট শব্দে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে কেশবপুর বিএনপি অফিসে। এ ঘটনায় দলের ৯ জন নেতা-কর্মী রক্তাক্ত হন। সব দোষ চাপানোর চেষ্টা করা হয় প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের ওপর। আর ভাঙচুরের শিকার হয় স্থানীয় পল্লী বিদ্যুৎ অফিস। কারণ বোমা হামলার ঘটনা যখন ঘটেছিল, তার একটু আগেই বিদ্যুৎ চলে যায়। তবে এর কিছুদিন পর ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়। অভিযোগ উঠেছিল, স্থানীয় ছাত্রদলের একটি অংশই এ বোমা হামলা চালিয়েছে। এমন অভিযোগ ওঠায় বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যান থানা ও জেলা বিএনপির নেতারা। কারণ ঘটনাটি স্থানীয় বিরোধী দলের 'ক্যাডাররা' ঘটিয়েছে বলে প্রথম পর্যায়ে তারা ময়দান গরম করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে বোমা হামলার নেপথ্য ঘটনা ও কারা করেছে তা জানাজানি হয়ে গেলে তারা চুপসে যান এবং কেশবপুর উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি মুসফেক উস সালেহীন মাসুমকে দল থেকে বহিষ্কার করেন। কিন্তু তারপরও অনেকের মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল- সত্যিই মাসুম ঐ ঘটনায় জড়িত ছিল, না কি সে ষড়যন্ত্রের শিকার? এ নিয়েও বিবাদ ছিল জেলা ও উপজেলা নেতৃবৃন্দের মধ্যে। কিন্তু অতি সম্প্রতি তারও অবসান ঘটেছে। কেশবপুর থানার পুলিশ ঐ ঘটনায় দায়ের করা মামলার তদন্ত শেষে ৬ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে। আর এতে যাদেরকে অভিযুক্ত করা হয়েছে তাতে শুধু সুমন নয়, অন্যরাও সবাই ছাত্রদল ক্যাডার। তারা হলো কেশবপুর থানা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক জাকির হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক তরিকুল ইসলাম, ছাত্রদল ক্যাডার জাহাঙ্গীর হোসেন, জাহিদ ও বিএনপি কর্মী বজলুর রহমান। চার্জশিট নং-৬, তারিখ ১৫.১২.০৫। নিজ দলের অফিসে বোমা হামলার এ ঘটনা পুলিশি তদন্তেও প্রমাণিত হওয়ায় চরম বিব্রত হয়ে পড়েছেন বিএনপিসহ এর অঙ্গসংগঠনের নেতারাও। এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিএনপি নেতা বলেন, শুধু কেশবপুর নয়, যশোরের অন্যান্য স্থানেও ছাত্রদল-যুবদলের একশ্রেণীর নেতা-কর্মীরা যা করে বেড়াচ্ছেন তাতে দলের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষের সামনে। ঐ নেতার বক্তব্যের সূত্র ধরে খোঁজ নিয়েও ছাত্রদলের একশ্রেণীর নেতাদের এমন কর্মকান্ডের খবর জানা যায়, যা সত্যিই দলের জন্য ক্ষতিকর আর নেতাদের জন্য বিব্রতকর।

২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, কেশবপুরের ঘটনাটি অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে ঘটলেও এমন অনেক ঘটনা কেউ কেউ ঘটিয়েছেন যা লোকসম্মুখে বলাও যায় না। ৮ অক্টোবর নিজ দলের কার্যালয়ে বোমা হামলার ঘটনা নিয়ে যখন সর্বত্র জোর আলোচনা-সমালোচনা চলছিল, ঠিক তখনই আরেক কান্ড ঘটিয়ে বসেন স্বয়ং জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাবিবুল ইসলাম কচি। ২৫ অক্টোবর তিনি ঝিকরগাছা উপজেলার ছুটিপুরে ৩ বোতল ফেনসিডিলসহ স্থানীয় ফাঁড়ি পুলিশের হাতে আটক হন। তিনি যে মোটরসাইকেলটি চালিয়ে গিয়েছিলেন তাও নাকি ছিল চোরাই। কারণ মোটরসাইকেলটির কোনো কাগজপত্রও দেখাতে পারেননি তিনি। কচির বিরুদ্ধে এমন অভিযোগও রয়েছে যে তিনি চোরাই মোটরসাইকেল সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত। যদিও তিনি তা অস্বীকার করেন। তবে কচি অস্বীকার করলেও দলের একটি সূত্র এর সত্যতা স্বীকার করে। আর সবচেয়ে বড় সত্য হলো, যশোরের চোরাই মোটরসাইকেল কেনাবেচার যে শক্তিশালী সিন্ডিকেট রয়েছে তাও নিয়ন্ত্রণ করেন ছাত্রদলেরই এক প্রভাবশালী নেতা। শহরের এমএম কলেজ এলাকায় বসবাসকারী ঐ ছাত্রদল নেতা একজন ডাকসাইটে সন্ত্রাসীও। যে কারণে কেউ তার ঐ অপকর্মের প্রতিবাদ করেন না। অবশ্য তার জন্য দলের অনেককেই বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়।

এর আগে আরও ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটায় বাঘারপাড়া থানা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক বিল্লাল হোসেন ও ক্রীড়া সম্পাদক হাফিজুর রহমান। দীর্ঘদিন ধরেই তাদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, ছিনতাই, রাজাহানির অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় নানা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পেতেন না। কিন্তু পাপ যে বাপকেও ছাড়ে না বলে যে প্রবাদটির প্রচলন রয়েছে তার বাস্তবতা ঘটে ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪। অন্যান্য দিনের মতো ছিনতাই, চাঁদাবাজি করতে তারা দাঁড়িয়ে যায় যশোর-নড়াইল সড়কের তুলোরামপুর ব্রিজের পাশে। এক পর্যায়ে শিকারও পেয়ে যায় তারা। দেখতে পায় এক মোটরসাইকেলে ৩ যুবক যাচ্ছে নড়াইলের দিকে। তাও আবার কোনো নম্বর প্লেট নেই গাড়িতে। ব্যস, দু'জন ছাত্রনেতা হম্বিতম্বি করে তাদের কাছে 'জরিমানা' হিসেবে দাবি করল ৪ হাজার টাকা। তারা টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় তাদের অনেকটা ধরে নিয়ে যাওয়া হয় করিমপুর গ্রামে। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে সেখানে হাজির হয় বাঘারপাড়া থানা পুলিশ। তারা আসার পর মোটরসাইকেল আরোহী ৩ যুবক তাদের পরিচয় দিলে সবাই থ' হয়ে যায়। জানা যায়, ৩ জনই সেনা অফিসার। এরপরই পুলিশ গুণধর ঐ ২ ছাত্রদল নেতাকে আটক করে নিয়ে যায়। বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে গোটা এলাকায় ছিঃ ছিঃ রব পড়ে।

এদিকে গত ১৭ অক্টোবর যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আবু মুসা মিন্টু ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা ঘটায় আরেকটি কেলেঙ্কারির ঘটনা। তারা ঐ দিন ভারত থেকে আমদানি করা ঢাকা ও বরিশালের ২ আমদানিকারকের ভাড়া করা মশুরডাল ভর্তি ২টি ট্রাক (ঢাকা-মেট্রো-ট-১৪-১৬৯০ ও ঢাকা মেট্রো-ট ৩৭৬৩) ঝিকরগাছার লাউজানিতে থামিয়ে ৫ টন মশুরির ডাল নামিয়ে নেয়। ১৮ অক্টোবর ট্রাক দুটি গন্তব্যে পৌঁছলে আমদানিকারকরা কম মাল পাওয়ায় ট্রাক দুটি আটকে রাখেন। এরপর যশোর জেলা ট্রাক ও ট্যাঙ্কলরি শ্রমিক ইউনিয়ন নেতাদের হস্তক্ষেপে ঘটনার মীমাংসা হয়। তবে এ জন্য মিন্টুসহ তার সাঙ্গপাঙ্গদের জরিমানা দিতে হয় ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা। এর মধ্যে মিন্টুকে গুনতে হয় ৬০ হাজার টাকা। তবে সব ঘটনা পেছনে ফেলে ছাত্রদল নেতাদের যে সব অপকর্ম এখনও আলোচনার খোরাক জোগাচ্ছে, তাহলো নারী কেলেঙ্কারি। আর এ ব্যাপারে যাদের দিকে সবাই আঙুল উঁচু করেন, তারা সবাই জেলা ছাত্রদলের নেতা। এ ব্যাপারে স্থানীয় পত্রপত্রিকায় ব্যাপক লেখালেখি হয়।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, ঢাকার বাড্ডা এলাকার এক ছাত্রদল নেতা ও মাদক ব্যবসায়ী গত আগস্ট মাসে যশোর পুলিশের হাতে ফেনসিডিলসহ ধরা পড়ে। এরপর স্বামীকে ছাড়াতে ঢাকা থেকে ছুটে আসে ঐ ছাত্রদল নেতার সুন্দরী স্ত্রী। সে যশোরে আসার পরপরই তাকে কব্জায় নিয়ে নেয় জেলা ছাত্রদলের তিন নেতা। এরপর তার স্বামীকে ছাড়িয়ে দেয়ার কথা বলে বিভিন্ন বাড়ি ও হোটেলে অন্তত ১৫ দিন একপ্রকার আটকে রাখে। ঐ সময় ৩ ছাত্রনেতা দলীয় সহকর্মীর স্ত্রীকে নিয়ে যে অপকর্ম করে তা ফাঁস হয়ে গেলে ছাত্রদলের কর্মকান্ড নিয়ে আবারও যশোরে ছিঃ ছিঃ পড়ে যায়। সবচেয়ে লজ্জার কথা, জেলা ছাত্রদলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা এক নেতাও অপকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিল। অপর দুজনেরই নাম জাহিদ। এভাবে ছাত্রদল নেতাদের অপকর্ম নিয়ে চরম বিব্রতকর অবস্থায় রয়েছেন জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা। তাদের কর্মকান্ডে সবাই ক্ষুব্ধ। কিন্তু দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর কোনো ব্যবস্থা না নেয়ায় বিএনপি ও ছাত্রদল-যুবদলের সাধারণ নেতা-কর্মীরা শীর্ষ নেতাদের ওপর চরম ক্ষুব্ধ।